অদামৃতকথা
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের যাত্রাপথের অপূর্ব আখ্যান-গাথা

শিবাজীপ্রতিম বসু

ইতিহাস নিয়ে, অতীতের ধূসর স্মৃতি বা স্মৃতিবাহিত মহাকাব্য নিয়ে, দেশে দেশে ধ্রুপদি সাহিত্যকারদের আগ্রহ চিরন্তন হলেও আধুনিক কালের পশ্চিমী গদ্যসাহিত্যে কল্পনামিশ্রিত কাহিনির যে স্ফূরণ, 'নভেল' বা উপন্যাস বলে পরিচিত হয়ে পাঠককুলের হৃদয়সাম্রাজ্যে ঘাঁটি গাড়ল, সেই নবোদিত উপন্যাসের সঙ্গে কয়েক চামচ 'ইতিহাসের' অনুপান মিশিয়ে, স্যার ওয়াল্টার স্কট, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে পর পর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক এমন এক সাহিত্যিক ককটেল বানালেন যে ফরাসি বালজাক, হুগো, ফ্লবের থেকে রুশ দস্টয়েভস্কি, তলস্তয় সমেত গোটা ইউরোপ, মায় আমাদের 'সাহিত্যসম্রাট' বঙ্কিম অব্দি সেই মৌতাতে মজলেন। অচিরেই বঙ্কিমের 'ঐতিহাসিক' উপন্যাসগুচ্ছ বঙ্গীয় সাহিত্য সরোবরে এমন তরঙ্গ তুলল যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি পৃথক ধারা/'genre' গড়ে উঠল। এঁদের প্রায় সকলেরই লক্ষ্য ছিল পরাধীন ভারতে জাতীয়তার উদ্বোধন করতে একটি কল্পনাশ্রয়ী মহান 'ইতিহাসের' ভিত গড়া। বঙ্কিমের সমসাময়িক ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে পরবর্তী প্রজন্মের রবীন্দ্রনাথ হয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কে নেই এই ধারাতে! কিন্তু প্রশ্ন উঠল, ঐতিহাসিক উপন্যাস কতটা 'ঐতিহাসিক'? দেখা গেল, শতকরা নব্বই থেকে নিরানব্বই ভাগই কল্পনা। যেমন, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী-র প্রোটাগনিস্ট, জগৎসিংহ, আদৌ বীর নয়, কার্যত ডরপোক ছিলেন। এই ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক শরদিন্দুর অবশ্য এসব নিয়ে কোনও রাখঢাক ছিল না। তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নভেল, কালের মন্দিরা-র প্রারম্ভেই পাঠককুলকে জানিয়ে দিচ্ছেন, ''আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তর চরিত্র ঐতিহাসিক''।

বিশ শতকের গোড়ায় আরেক ধরনের প্রয়াস শুরু হল ইতিহাস রচনার দিক থেকে। ইতিহাসের দু'একটা বীজ নিয়ে উপন্যাস রচনা নয়, কাহিনিভিত্তিক আখ্যান বা ন্যারেটিভ-এর আঙ্গিকে ইতিহাস রচনার প্রয়াস, এর লক্ষ্য। এই নতুন ঘরানার নাম আখ্যান-ইতিহাস বা 'ন্যারেটিভ হিস্ট্রি'। নামটি দেন ফরাসি ঐতিহাসিক ও অ্যানাল স্কুল-এর প্রবক্তা, ফার্নান্দ ব্রদেল। উনিশ শতকের শেষে ধারণাগত দিক থেকে এই নতুন ধারার উৎপত্তি হলেও, তার আধুনিক বিশ শতকীয় রূপটি, প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় যেভাবে ঘটনা পরম্পরার অনমনীয় কাঠামো অনুসরণ করা হয়, তাকে ভেঙে প্রয়োজনে ঘটনাক্রমকে আগুপিছু করে কাহিনির আখ্যানটি গড়ে তোলে। যেভাবে, ইতিহাস-গবেষকরা হারমেনিউটিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, অতীতে অবগাহন করে, ঐতিহাসিক সময়ের পুনর্নির্মাণ করে বর্তমানে লুপ্তপ্রায় শব্দ/প্রথার 'পাঠ্য ব্যাপৃতি' ঘটিয়ে তাকে অনুভব/উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন, আখ্যান-ইতিহাসকার তেমনটাই করেন।

সেই সঙ্গে থাকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বিবিধ ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যারও প্রয়াস। পাশাপাশি আখ্যানকারের স্বাধীনতা থাকে আখ্যানের প্রয়োজনমতো, অতীতের তথ্যগুলি ঝাড়াইবাছাই করে গ্রহণ-বর্জন করা। ''কেন ওই তথ্যটা বাদ গেল এবং কেনই বা অন্যটা ঢুকল?'', এমন প্রশ্ন প্রথাগত ঐতিহাসিকদের করা গেলেও আখ্যান-ইতিহাসকার সেই জবাবদিহির 'বাইরে'ই থাকেন। (প্রসঙ্গত, 'হারমেনিউটিক্স'-এর বাংলা 'পাঠ্য ব্যাপৃতি' করার কপিরাইট প্রগাঢ় পণ্ডিত, অনিরুদ্ধ লাহিড়ি বা 'চাঁদ-দা'র।)

বাঙালির সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উন্মেষ থেকে প্রতিষ্ঠার মধ্য পর্যায় অব্দি বিস্তৃত, দুই নাট্যাচার্য — অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি বা 'অদা' এবং অমৃতলাল বসুকে কেন্দ্র করে অতি বিচিত্র ও সুবিশাল কালখণ্ড নিয়ে রচিত, সাম্প্রতিক বাংলার অন্যতম সেরা সাহিত্যিক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব ব্রাত্য বসুর যুগন্ধর আখ্যান, অদামৃতকথা-র টেকস্ট-এর শরীরের সঙ্গে উপরে কথিত আখ্যান-ইতিহাস ঘরানার অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকলেও, তাকে কি পুরোপুরি 'ন্যারেটিভ হিস্ট্রি' বলেই আখ্যায়িত করতে পারি? নাকি, কোনও ঘেরাটোপে বন্দি না হয়ে, নানা ধারার সৃষ্টিশীল প্রয়োগে অদামৃতকথা নিজেই একটি স্বতন্ত্র রচনাশৈলীর উদ্বোধন করল? গ্রন্থটির পাঠ সম্পূর্ণ হলে রচনার এই ভিন্ন গোত্রটি স্পষ্ট হয়। এই লেখা ও অন্যান্য (নাট্যসহ) রচনায় লেখকের ইতিহাসমনস্কতা ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় আমরা বারবার পেয়েছি। তবু লেখক পেশাদার ঐতিহাসিক নন; সাহিত্য-সংস্কৃতির দিক থেকে — তার নানা কলকব্জার উদ্ভব ও বিকাশ এবং তার প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত কুশীলবদের দ্বন্দ্ব ও আনন্দমাখা সৃষ্টিশীল জীবনের অতীত অধ্যায়গুলি পুনর্নির্মাণ করতেই তাঁর ইতিহাসের চৌকাঠে ফিরে ফিরে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, গঠনের দিক থেকেও এটি অনুপম। আখ্যানের উপন্যাসধর্মিতা ও ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে পৃথক খাতে বয় না, উপন্যাসের বহমানতা ভেঙে দিয়ে ঢুকে পড়ে ইতিহাসের নানা অনুপুঙ্খ তথ্য, নানা ব্যক্তিত্ব ও ঘটনা নিয়ে আলোচনা/প্রতিবেদনের টুকরো। এইসব বিবরণী ও তথ্যরাজি জমে উঠতে থাকা উপন্যাসকে কখনও কখনও ইন্টারোগেট করে, কখনও বা তাকে পুষ্ট করে, তার হাত ধরে পথ চলে। এই ব্রেখটীয় হস্তক্ষেপে গল্পের চটকা ভেঙে যায়। সৃষ্টিশীল বাংলা গদ্য আখ্যানে এমন উদাহরণ বিরল। এর আগে আমরা কেতকী কুশারী ডাইসনের রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে-তে উপন্যাস ও গবেষণা-কে সমান্তরালভাবে চলতে দেখেছি। কিন্তু তা কখনই অদামৃতকথা-র মতো একটি বিশিষ্ট যুগের — বাংলা নাট্য ও মঞ্চের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত, অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি মানুষ — পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল, কিংবা ম্লান বা ক্ষয়ে যাওয়া, অথবা সারাজীবন উইঙের ধারে দাঁড়ানো এত চরিত্রের সঙ্গে সংলাপে মাতেনি। সত্যিই, বইয়ের দুই মলাটের মধ্যে জানা-অজানা কত মুখের সারি!

কেবল অর্ধেন্দুশেখর বা অমৃতলাল নন, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের প্রথম নক্ষত্র চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র; সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম সার্থক মঞ্চ ও পশ্চাৎপট নির্মাতা মহাপ্রতিভাধর অথচ দারুণ বিতর্কিত ধর্মদাস সুর; উঠতি নট, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বয়োজ্যেষ্ঠ অর্ধেন্দু, ধর্মদাস, নগেন্দ্রদের সঙ্গে জুটে যাওয়া — দশ টাকার নোট জ্বেলে সিগারেট ধরানো, বাগবাজারের প্রবল ধনী নিয়োগী পরিবারের অকালপক্ক বালক উত্তরাধিকারী তথা প্রথম পাবলিক থিয়েটারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক (এখন বিস্মৃতপ্রায়) ভুবনচন্দ্র — কে নেই! আছেন পাথুরিয়াঘাটের ঠাকুর পরিবারের দুই মহারাজ তথা 'অদা'র পিসতুতো দাদা যতীন্দ্রমোহন ও তাঁর ভাই শৌরীন্দ্রমোহন। চরিত্র হিসেবে সাহিত্যিক-প্রশাসক নবীন সেন, নাটককার দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, জোড়াসাঁকোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তস্য ভ্রাতা তখন-উঠতি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথও রেফারেন্স হিসেবে আছেন। আছেন তিনকড়ি থেকে গোলাপসুন্দরী, তারাসুন্দরী, হরিমতি বা

গুলফম হরি, বিনোদিনী দাসীর মতো বারাঙ্গনা-মাতৃজঠরে জন্মানো অসামান্য কন্যারা, যাঁদের যোগদানে বাংলা রঙ্গমঞ্চ অনেকটা লিঙ্গবৈষম্য মুক্ত হয়েছিল। এছাড়াও প্রথম যুগের থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত এত মানুষ জীবন্ত হয়ে আছেন যে স্রেফ তাঁদের নাম উল্লেখেই এই আলোচনার পরিসর শেষ হয়ে যাবে।

পাশাপাশি প্রবল ভাবে আছে কলকাতার — মুখ্যত, খানাখন্দ, পানা পুকুর, কাঁচা নর্দমা ও রাস্তা সম্বলিত উত্তর কলকাতার বা নেটিভ ব্ল্যাক টাউনের — গড়ে ওঠার, 'আধুনিক' হয়ে ওঠারও ইতিবৃত্ত। সঙ্গে জানাতেই হচ্ছে, এই আখ্যান ইতিকথা যখন সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন তাতে পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অদামৃতকথা-য় সংযুক্ত গিরিশচন্দ্রের ওপর নিবেদিত বিস্তৃত ষষ্ঠ অধ্যায়টি ছিল না, যেখানে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ও মনোজগতের নানা টানাপোড়েন, প্রথম পক্ষের পুত্র মহা-প্রতিভাবান অভিনেতা দানীবাবুকে নিয়ে তাঁর টেনশন, বা দ্বিতীয় পক্ষের মৃতমাতৃক তাঁর অসুস্থ শিশুপুত্রটি নিয়ে স্নেহ ও উদ্বেগ এমনভাবে বিবৃত হয়েছে, যে নটশেখর গিরিশচন্দ্রের আবরণ সরিয়ে ব্যক্তি গিরিশের বেদনায় আমরাও আতুর হই। সেই কারণেই ধারাবাহিকের পাঠককুলকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বইটি পড়তেই হবে।

তৃতীয়ত, আধুনিক বাংলার আভাঁ গার্দ সাহিত্যের মতোই অদামৃতকথা ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও আখ্যান — যেখানে বঙ্কিমী তৎসমপ্রধান, ঐশ্বর্যময় ঋজুতার সঙ্গে মিশেছে 'হুতোমি' (কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশার অনুসারী) 'কলকেতা'র প্রাণবন্ত, শুচিবাই-হীন, কথ্য এমনকি 'অশিষ্ট' ভাষা, এমনকি হাল আমলের ইঙ্গবঙ্গ মিশ্র বাংলাও! ফলে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য বা রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়রা তাঁদের নিজস্ব ডিকশনে ভিন্ন গোত্রের গদ্য সাহিত্যে যে ট্র্যাডিশন রেখে গেছেন, ব্রাত্য বসুর অদামৃতকথা নিঃসন্দেহে তাতে একটি মূল্যবান সংযোজন। দু'একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

বিষয় — আখ্যানের একদম শুরুয়াতি অধ্যায়। স্থান — বারাণসীর মণিকর্ণিকা ঘাট। কাল — ১৮৭২ সালের ২৬ মার্চ, মঙ্গলবার। আগের দিন দোল গেছে, সেদিন বুড়ুয়ামঙ্গল উৎসবের দিন। বহু পুণ্যার্থীর সমাগমে গঙ্গার ঘাট জমজমাট। পাত্র — দুই 'অনতিতরুণ'। প্রথম জন বয়োজ্যেষ্ঠ, কবি তথা রাজকর্মচারী — বিহারের ভবুয়া সাব-ডিভিশনের নবনিযুক্ত ডেপুটি, নবীনচন্দ্র সেন (বয়স পঁচিশ) এবং আখ্যানের অন্যতম প্রোটাগনিস্ট, ভবিষ্যতের নাট্যাধক্ষ, নাটককার ও অভিনেতা অমৃতলাল বসু (ডাক নাম 'ভুনি', বয়স মাত্র উনিশ) — যিনি এখন তাঁর পিতৃবন্ধু, হোমিওপ্যাথির প্রখ্যাত চিকিৎসক, লোকনাথ মৈত্রের কাশীস্থিত বাড়িতে থেকে শিক্ষানবিশী করছেন। লোকনাথবাবুর গৃহে দুই তরুণের আলাপ, এখন দু'জনেই ভাগীরথীতীরে।

''অতএব, এই বুড়ুয়ামঙ্গলের দিনে, অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ অবলোকনকল্পে, সমাগত প্রাবৃটদিনান্ত শোভা সমগ্র জাহ্নবীর বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় প্রতিফলিত হচ্ছিল। সম্পূর্ণশরীরা যৌবনের পরিপূর্ণতায়, উন্মাদিনী স্রোতস্বিনীর তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হয়ে, বারাণসীবিভূষিতা মণিকর্ণিকার কূলে ঈষৎ ঈষৎ প্রতিঘাত করছিল। গম্ভীর মিতবাক ম্যাজিস্ট্রট, সদ্য লোকনাথ-বাসস্থানে আলাপিত হওয়া ও তৎ-সমভিব্যাহারে জাহ্নবী সন্নিধানে আসা, ওই এলোকেশ স্ফূরিতওষ্ঠ ও চপলস্বভাবের হবু হোমিওপ্যাথ ভুনি চিকিৎসকের দিকে একটি অপাঙ্গ দৃষ্টি দিলেন। অতঃপর বাবু নবীনচন্দ্র বললেন, কালি, কলম, কাগজ তো প্রস্তুত, কিন্তু অনুপান আরক? সুরসিক ভুনি প্রথমে শিস দিয়ে উঠে দু'কলি জোড়াসাঁকোর জমিদার দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে গাওয়া তাদের বাগবাজারি রূপচাঁদ পক্ষীর পদ্য বললে,

কি মজা আছে রে লাল জলে, জানে ঠাকুর কোম্পানী।
মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি, জানে ঠাকুর কোম্পানী।

অনন্তর, অমৃত তার ঝুলন্ত পাঞ্জাবির পকেটে লুক্কায়িত, মধ্যমাকৃতি, রক্তাম্বুদবিভূষিত, রম্-এর ডিক্যান্টার তথা একটি চ্যাপ্টা বোতল বার করল।...

অতঃপর বিষন্ন কবির, বঙ্গাল মুখমণ্ডলে ঈষৎ রসসঞ্চারকারী আর্দ্র হাস্য পরিলক্ষিত হল। কিন্তু সুরসিক অমৃতলাল, দুষ্ট রাঢ়ি অমৃতলাল, অধরে রহস্যময় পরান্মুখ নালিঘাসম দলমালাময়ী হাস্য চেপে রাখা প্রফুল্লানন অমৃতলাল, বাবু নবীনচন্দ্রকে সহসা ঘাড় বেঁকিয়ে গঞ্জনাকণ্ঠে ভুনি হয়ে বললে, 'লিখবে তো লেখ, নইলে মদ দেবো না। নবীন এক নিঃশ্বাসে বুড়ুয়ামঙ্গল লিখিয়া ফেলিল।" (প্রথম অধ্যায়, পৃঃ ৬)

আরেকটি উদাহরণের অবতারণা। বিষয় — সেই সময়কার একজন আমুদে অথচ প্রবল প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী গুলফম হরির চরিত্রচিত্রণ ও তার সঙ্গে অর্ধেন্দুর একটি নাটকের দৃশ্যের সকৌতুক বিবরণী। কিছুটা লম্বা, তাই খানিকটা ছেঁটেকেটে পেশ করছি :

''...রসের আদি ছিল হরিমতি তথা গুলফম হরি। তার যেমন গায়ের মাজা রং, লম্বাচওড়া চেহারা, হাস্কি গলার আওয়াজ, তেলতেলে পুরু ঠোঁট আর তেমনি খচরি বুদ্ধি।... স্টারে যখন দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বী' নাটকে মূল চরিত্র জলধর সেজেছে অর্ধেন্দু, আর তার বউ জগদম্বা করেছিল গুলফম হরি। তখন গুলফমের এমন মঞ্চে ইমপ্রোভাইজ করার ক্ষমতা ছিল, এমন অব্যর্থ সেন্স অফ কমেডি ছিল যে, অর্ধেন্দুর মতো বহুখ্যাত কমেডিয়ানও নাকি মাঝে মাঝে ভয় পেত।

একদিন থিয়েটারের মঞ্চে সলোমন বলে এক ইহুদি সাহেব দর্শক... গুলফমের অভিনয় দেখে এত খুশি হন যে, দর্শক আসন থেকে গুলফমের জন্য একটি গাঁদাফুলের মালা সলোমন ছোঁড়েন ও সেটা অভিনয়রত গুলফম হরির গলায় গিয়ে পড়ে।... একটু পরেই ঘটবে মঞ্চে জলধররূপী অর্ধেন্দুর প্রবেশ।

সিনটি ছিল, জলধর ঢোকার পর প্রথমে জগদম্বারূপী গুলফম হরি, স্বামীকে অন্য মহিলা নিয়ে বেজায় খামারি করবে ও অপদস্থ সেই স্বামী অর্থাৎ জলধররূপী অর্ধেন্দু, তার কিছু নির্ধারিত সংলাপ বলবে। কিন্তু গালি দিতে গিয়ে জগদম্বা ঘোমটা খোলে ও তার মাজা গ্রীবায় কিছুক্ষণ আগে পাওয়া সেই গাঁদাফুলের মালাটি পরিলক্ষিত হয়। সচকিত অর্ধেন্দু তো মালা দেখেই থমকেছে। তারপর চড়া গলায় সে বললে, 'আমায় তো কথায় কথায় সন্দেহ করো। এই যে গলায় বাহারের মালা দুলছে , মালাটি ঝোলালে কে? অ্যাঁ, কে? বল কে দিলে?'

সুরসিকা, প্রত্যুৎপন্নমতি, হাড়ে হারামি, গুলফম হরি তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টেনে, প্রথম রো-এ বসে থাকা দর্শক সলোমন সাহেবকে আঙুল দেখিয়ে সুমিষ্ট গলায় বললে, 'ওই যে গো আমার নন্দাই নাগর। ও দিয়েছে গো।'

অর্ধেন্দু পর্যন্ত নাকি সেই রাতের সমবেত অট্টহাস্য করা দর্শকদের সঙ্গে মিশে, মঞ্চে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হাসতে বাধ্য হয়েছিল।...

...অর্ধেন্দুর হাসির মধ্যে ছিল এক ধরণের তীক্ষ্ণ প্রসন্ন উইট আর যৌন আবেদনে ভরপুর হরিমতির কৌতুকে ছিল নিম্নেতর আদিরস। এমারেল্ডে থাকার সময় গুলফম হরি নাকি ব্যাকস্টেজে অন্য অভিনেত্রীদের সামনে, হাতে একটি ছোট বল নিয়ে দেখিয়েছিল, এই একই বল মালিক গোপাললাল শীল আর নাট্যাধ্যক্ষ গিরিশ ঘোষ। পার্থক্য এই যে, নাট্যাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে বলটি ওপরে তুলে আস্তে আস্তে কোমল ভাবে লুফতে হবে আর গোপাল শীলের বেলায় বলটি মেঝেতে ড্রপ খাইয়ে বলের মাথায় ক্রমাগত চাঁটা মেরে যেতে হবে। এমন মজাদার অশ্বেতরা মহিলা ছিল গুলফম হরি।" (পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৯২-৯৩)

বারাঙ্গনা ঘরের মেয়েদের অভিনয়ের আঙিনায় আনার ব্যাপারে অনেকেরই ট্যাবু ছিল প্রবল। তার আগে কমনীয়কান্তি পুরুষরাই 'মেয়ে' সাজতেন। সাধারণ ভাবে, পরিবারের বাইরে ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে

পরিচয় প্রায়-অসম্ভব ছিল। তাই সমবয়সী তরুণ যুবাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রবল প্রীতি, যা অনেকসময় সাধারণ বন্ধুত্বের সীমা অতিক্রম করত, তারও একধরনের সামাজিক অনুমোদন ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর প্রাণের বন্ধু গৌরদাস বসাকের মধ্যে এমনই এক গভীর প্রীতির কথা আমরা জানি। অর্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালের মধ্যেও কি তেমনই এক বন্ধুতার রসায়ন ছিল? পুরোটা না বললেও, কিশোর বয়স থেকে একে অন্যের (বিশেষত, অমৃতের 'অদা'র জন্য অমৃতের) প্রতি যে 'অনুরাগ', যে মান-অভিমানের নিদর্শন লেখক দিয়েছেন, তাতে এমন ধারণাই পুষ্ট হয়। বিশেষত, ১ মার্চ, ১৮৭৬, গ্রেট ন্যাশানালের মঞ্চে উপেন্দ্রনাথ দাশের লেখা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনয়ে তথাকথিত 'অশ্লীলতার' দায়ে (নাটকে এক কাল্পনিক ইংরেজ জেলাশাসককে দেশীয় রমণীর বলাৎকারেচ্ছু হিসেবে চিত্রণের কারণে) যখন ৪ মার্চ উপেন্দ্রনাথসহ নাটকের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের সঙ্গে অমৃতকেও গ্রেপ্তার করে লালবাজারে নিয়ে গেল — অথচ, তাঁর সখা অর্ধেন্দু এব্যাপারে কোনও খোঁজখবর নিল না, একটা চিঠিও দিল না — এই নিয়ে অমৃতের তীব্র অভিমানে তা স্পষ্ট হয়। লেখকের কল্পনায় এই 'অভিমান' প্রকাশিত হয়েছে এক বছর পর, ১৮৭৭ সালে, যখন অমৃত পুলিশের চাকরি নিয়ে পোর্ট ব্লেয়ার যাওয়ার জন্য জাহাজের কেবিনে একাকী রাত্রিবাস করছে, তেমনই এক নিঃসঙ্গ রাতে। এই অবকাশটি, অভিমান প্রকাশের পাশাপাশি, ব্রাত্য কাজে লাগিয়েছেন, সাধারণ রঙ্গালয়ের বিবর্তন, গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দুসহ তখনকার নানা শিল্পীদের নাট্যজীবন ও নানা অ্যানেকডোট নিয়ে অমৃতলালের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আখ্যানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরে, একইভাবে লেখক, অমৃতের প্রতি 'লেখা' অর্ধেন্দুর 'কখনও না-পোস্ট করা' দীর্ঘ চিঠির রোমন্থন কেন্দ্র করেও আখ্যান-কথাটিকে গতি দিয়েছেন।

অভিনেতা ও নাট্যচার্যের চেয়েও অমৃত যশস্বী ছিলেন নাটক, বিশেষত, 'প্রহসন' রচনার জন্য এবং কবি হিসেবেও। 'মুস্তাফি সাহেব' বা অর্ধেন্দুর কিন্তু খ্যাতি তাঁর অসামান্য অভিনয়প্রতিভার জন্য (যা অনেক সময়েই গিরিশচন্দ্রকেও ছাপিয়ে গেছে) এবং কিংবদন্তী অভিনয়-শিক্ষক হিসেবে। এই শেষোক্ত বিষয়ে স্বয়ং গিরিশও তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। এই শিক্ষা অনেক সময়েই কোনও অভ্যস্ত পথের ধার ধারত না। বুক-ভাঙা কান্নার মঞ্চে উপস্থাপন কেমন হবে, বোঝাতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে সন্তানহারা বাবা ও মায়ের কান্নার তফাৎ বুঝতে বলেছেন। আরেকবার এক অভিনেতা রিহার্সালে দমফাটা হাসি সঠিকভাবে 'তুলতে' বারবার ব্যর্থ হওয়ায় নাট্য-শিক্ষক অর্ধেন্দু তাঁকে অভয় দিলেন। অভিনয়ের দিন স্টেজে ঢোকার মুখে অভিনেতাটি দেখেন, বিপরীত উইং-এ অর্ধেন্দু সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গি করে দণ্ডয়মান! তা দেখে ওই অভিনেতার দমফাটা হাসি আর থামতেই চায় না। কিন্তু প্রথম যুগের ভগীরথদের এমন হিমালয়তুল্য প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁরা বাঙালি সমাজের যুগসঞ্চিত অভিশাপ — ভাঙাভাঙি, দলাদলি এবং 'ল্যাং মারামারি' থেকে মুক্ত হতে পারেননি। বারবার দল ভেঙেছে, একদা বন্ধু-সহকর্মীরা মেতে উঠেছে ব্যক্তিগত কুৎসায়। খিস্তি-খেউড়, তরজা আর সং-যাত্রার এই কাঁকড়ামি কি অচ্ছেদ্য কবচ-কুণ্ডলের মতো আমরা আজও বহন করে চলছি না!

সর্বসাধারণের প্রসেনিয়াম মঞ্চ গড়ে ওঠার বিবর্তনও অতি বিশদে ধরা আছে এই আখ্যানে, যার শুরু ধর্মদাস সুরের অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ দিয়ে। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালদের বাড়ির বিশাল প্রাঙ্গণে টিকিট বেচে, দীনবন্ধু মিত্র-র নীলদর্পণ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে, ধর্মদাসের তৈরি করা স্টেজে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পেশাদারি থিয়েটারের যে-সূচনা হল, সেটিও কিন্তু তার আগের (টিকিট না বেচে) থিয়েটারের মতোই ছিল অস্থায়ী। সামান্য উপকরণ দিয়ে অসামান্য মঞ্চ ও সেট বানানোর জাদুকর

ছিলেন ধর্মদাস। সেইসময় অভিনেতারাও ছিলেন মেজাজে বোহেমিয়ান, ভ্রাম্যমান থিয়েটার নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন ভারতের এদিক-সেদিক। ক্রমশ, তাঁরা থিতু হলেন, মঞ্চও স্থায়িত্ব পেল। কারণ, থিয়েটারে পয়সা উঠতে শুরু করেছে — গোড়ায় কিছু অভিনেতাদের সমবায় গোছের ব্যবস্থায় থিয়েটার চললেও, এবং তার হিসেব ও ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রবল বিতণ্ডার পর, ধীরে ধীরে তা ব্যবসায়ীদের — ক্রমে, মাড়োয়ারি অর্থ লগ্নিকারীদের পকেটে ঢুকতে লাগল। অভিনেতা/পরিচালকরা নেহাতই বেতনভুক কর্মচারীতে পরিণত হলেন।

এইভাবে আখ্যানটি আলো ফেলল বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক জলবিভাজিকায়। ফলে, তা হয়ে দাঁড়াল সাধারণজনকে 'ব্রাত্য' করে রাখা জমিদার বা বড়লোকদের সম্ভ্রান্ত 'প্রাইভেট' পরিসর ছেড়ে মঞ্চাভিনয় কীভাবে সর্বসাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক 'পাবলিক' থিয়েটারে রূপান্তরিত হল, তারও ইতিবৃত্ত। যেখানে মুখচেনা, হামবড়া আভিজাত্যের ওপরে স্থাপিত হল — সামাজিক উচ্চনীচ-থাক বিনাশী — আদ্বিজচন্ডালের প্রবেশাধিকার, কেবল পকেটের দম বা রৌপ্য মুদ্রার জোরই যার একমাত্র ভিত্তি। এ নিয়েও প্রচুর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত। নটসম্রাট গিরিশচন্দ্রই প্রথমে তীব্র বিরোধী ছিলেন সাধারণ দর্শকদের টিকিট বেচে পয়সা তুলে থিয়েটার করার। এই কারণে, বহুবার এই উদ্যোগ ছেড়ে চলে গিয়েও ফের ফিরে আসা এবং শেষে ভাল মাইনের আপিসের চাকরি ছেড়ে পরিচালক তথা ম্যানেজার হিসেবে পাবলিক থিয়েটারেই যোগদান।

অভিজাত বাড়ির দরবারী 'হাই কালচার' থেকে 'মাস কালচার'-এ এই যাত্রা আসলে প্রাক-আধুনিক ধ্রুপদী যুগ থেকে আধুনিক গণ-পরিসর ভিত্তিক আধুনিক নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠারও গল্প, যে আধুনিকতা আর কিছুদিন পরে যন্ত্রনির্ভর গণমাধ্যম গড়ে তুলবে। কমিশন করা শিল্পীর তুলির টানে আঁকা পোর্ট্রেট-এর জায়গা নেবে ক্যামেরায় তোলা ফোটোগ্রাফ। বিশুদ্ধবাদীরা ভুরু কোঁচকাবেন, কিন্তু অনিবার্যকে আটকাতে পারবেন না। এই নিয়েই উল্লেখ্য ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের জার্মান-ইহুদি তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের বিশ্ববিখ্যাত কাজ, 'দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন' (যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকর্ম)। প্রসঙ্গত, এই অসামান্য দার্শনিক নাৎসিদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ফ্রান্স ও স্পেন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার মুখে ধরা পড়ে নাৎসি গেস্টাপোদের থেকে বাঁচতে মরফিন খেয়ে আত্মহত্যা করেন ১৯৪০ সালে।

অভিনয় জগতে এই যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন — মুভি ক্যামেরার দৌলতে 'চলচ্চিত্র' হয়ে উঠে, দিকে দিকে, গাঁয়েগঞ্জে, এমনকি এলিট নাগরিক পরিসর ছেড়ে, আমজনতার দরবারে ছড়িয়ে পড়ল। গত শতকের বিশের দশক থেকে কলকাতাতেও সেই ঢেউ লাগল। এমনকি, এই আখ্যানের অন্যতম চরিত্র রসরাজ অমৃতলালও তাতে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় নামক যে উঠতি সাহিত্যিকের সঙ্গে অমৃতলাল পরিচিত হবেন, সেই নবীন যুবারও এই নতুন মাধ্যমে দারুণ আগ্রহ। হেমেন্দ্রর মুখেই শুনছেন, বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনারত এক নবীন অসামান্য নাট্যপ্রতিভার কথা, নাম, শিশিরকুমার ভাদুড়ি। এইভাবে লেখক তাঁর পাঠককুলকে বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উন্মেষ থেকে মধ্য পর্যায় অব্দি শুধু নিয়ে গেলেন না — অভিনয় জগতের মানুষদের মঞ্চ থেকে রুপোলী পর্দায় পৌঁছনোর শুরুর আখ্যানেরও আবহ রচনা করে গেলেন। এর সঙ্গে — গিরিশচন্দ্র-অর্ধেন্দু-অমৃতলাল-অমর দত্ত-দানীবাবু প্রমুখের যুগ পেরিয়ে থিয়েটারে অনাগত 'শিশিরযুগ'-এর ইঙ্গিতও দিয়ে গেলেন।

এই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের, বিশেষত শিক্ষিত বাঙালির রুচিও পাল্টাল। সাহিত্য-নাটকের ভাষাতেও সেই ছোঁওয়া লাগল। গিরিশ যুগ আধুনিক বাংলা ভাষা গড়ে ওঠার সময় — তাতে মাইকেল, কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) বা বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট। ব্রাহ্ম সংস্কৃতির প্রভাবে ঠাকুরবাড়ির কিছুটা

পিউরিটান, কিছুটা পেলব ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে সেইসময়কার নাটককারদের বেশ দূরত্বই ছিল। তখন উঠতি-প্রতিভা-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও গিরিশের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। বরং, রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ও পরে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনেকটা কাছের মানুষ ছিলেন। অমৃতলালও মুখে সেকথা না বললেও যে এই মনোভাব বহন করতেন, সে ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। যদিও তাঁর জীবিতদশাতেই রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পেয়ে বিশ্বে 'সেলিব্রিটি'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গানের মিস্টিসিজম, দার্শনিক উচ্চারণ; তাঁর নাটকে প্রতীক-সঙ্কেত বাহিত যে আধুনিকতা — তার রসাস্বাদন পুরনো যুগের শিল্পী-স্রষ্টারা হয়ত বা সেভাবে করে উঠতে পারেননি। অন্যদিকে, শিশির ভাদুড়িরা যখন বড় হচ্ছেন, তখনই বাংলা আধুনিক সাহিত্যে 'রবীন্দ্র-যুগের' সূচনা হয়েছে। স্বয়ং, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিম মালা পরিয়ে নতুন যুগের কবি তথা সাহিত্যিককে বরণ করেছেন। শিশির ভাদুড়ির যুবা বয়সেই রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল' পাচ্ছেন। সাহিত্য ও নাটকের ভাষা, রূপ ও দর্শন কলকাতা-বাংলার স্থানিকতা পেরিয়ে, বঙ্গীয়/দেশজ সংস্কৃতিতে প্রোথিত হয়েও সমগ্র বিশ্বের হয়ে উঠছে। শিশিরকুমারের প্রজন্মের ওপর এই রবীন্দ্রসৃষ্টির অভিঘাত প্রবল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পক্ষ থেকে তিনিই ক্রমাগত চেষ্টা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করার। আগেকার প্রজন্মের থেকে শিশিরকুমারের নানা প্রযোজনা তাই ভাষা ও রুচির দিক থেকে ভিন্ন মাত্রার।

প্রসঙ্গত, ব্রাত্যর অনুরাগী পাঠক মাত্রেই জানেন, অদামৃতকথা লেখা শেষের পর পরই তিনি শিশিরকুমার ভাদুড়ি-কে নিয়ে দ্যূতক্রীড়ক নামে অসামান্য উপন্যাস লিখেছেন। এর পরের অধ্যায় বাংলা 'পাবলিক থিয়েটার'-এর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া কমিউনিস্ট পার্টি অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত, গণনাট্যের আন্দোলন ও প্রচার কেন্দ্রিক, 'অ্যাজিট-প্রপ' থিয়েটারের যুগ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে শুরু হওয়া এই যুগের উন্মেষ, বিকাশ ও অবক্ষয় নিয়ে নাটককার ও পরিচালক হিসেবে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের অসামান্য কিন্তু 'ব্রাত্য' তথা বিতর্কিত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে রুদ্ধসঙ্গীত আমাদের আগেই উপহার দিয়েছেন। এর বেশ কিছুদিন পর অদামৃতকথা ও দ্যূতক্রীড়ক প্রায় পিঠোপিঠি প্রকাশিত হয়ে বাংলার নাটক ও সাংস্কৃতিক জগতের আখ্যান-ইতিহাসের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করল।

এই গণনাট্যের ট্র্যাডিশন ভেঙে পরবর্তীতে প্রতিভাবান অভিনেতারা বাংলায় অজস্র বামপন্থী আদর্শের থিয়েটার গ্রুপ তৈরি করলেন। যেহেতু এঁদের বেশিরভাগেরই মনে ও আচরণে 'পাবলিক থিয়েটার' সম্পর্কে এক প্রবল অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য বারবার প্রকট হয়েছে, তাই ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্র থেকে শিশির ভাদুড়ি অব্দি চলে আসা বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ — যা বহু অভিনেতা-নাটককার-পরিচালক-কলাকুশলীদের পেটের ভাত জুগিয়েছে — সে তার সাত দশকের কৌলীন্য হারিয়ে আখ্যাত হল 'সস্তা কমার্শিয়াল থিয়েটার', 'শ্যামবাজারী থিয়েটার' প্রভৃতি অপনামে। নতুন ধাঁচের গ্রুপ থিয়েটার আবর্তিত হল উত্তর কলকাতা ছেড়ে প্রথমে চৌরঙ্গী পাড়ার সিনেমা হলগুলিতে, পরে রবীন্দ্রসদন ও আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহ কেন্দ্র করে। অথচ, তা কখনওই আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর হতে পারল না। হয়ে দাঁড়াল, প্রয়াত (শিশির ভাদুড়ির শিষ্য) অনিল মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'এক ঠেলার থিয়েটার'। অর্থাৎ, নাটকের সীমাবদ্ধ বাজেটের জন্য এমনই সেট ব্যবহারের চল হল যা একটি 'ঠেলা গাড়ি'তে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

ক্রমে শিক্ষিত দর্শকরাও শ্যামবাজার থেকে মুখ ফেরাল — তখন 'পাবলিক থিয়েটার' নামক ধিক্কৃত পরিসরটি প্রথমে নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন, বেসরকারি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে নামী চলচ্চিত্র অভিনেতাদের নিয়ে ও নামী সাহিত্যিকদের রচনা ভিত্তি করে নানা প্রযোজনা চালিয়ে বাঁচতে চাইল। কিছুটা সফলও হল। ক্রমে সে আলোও নিভতে থাকে। উৎপল দত্ত, অজিতেশরা চেষ্টা করেও নতুন

ভাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে পারেননি। এরপর একটা নতুন ট্রেণ্ড আনলেন বাংলায় 'ব্রেখট'-এর নাটকের পথিকৃৎ, অসীম চক্রবর্তী। সুবোধ ঘোষের গল্প নিয়ে এবং কেতকী দত্তের সঙ্গে জুটি বেঁধে রাজাবাজারের প্রতাপ মঞ্চে শুরু করলেন, অতি সফল — 'ভালোবাসার ব্লো হট নাটক', 'বারবধূ'। তাঁর গায়ে অশ্লীলতার কালি লাগল। এ নিয়েই সম্প্রতি ব্রাত্য বসুর পরিচালনায় পাইকপাড়া ইন্দ্ররঙ্গের প্রযোজনায় 'অদ্য শেষ রজনী' নামে একটি অতি উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে এবং সফলভাবে হয়ে চলেছে। এরপরে একসময় হাতিবাগানের সারকারিনা, বয়েজ ওন লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে এই 'ব্লো হট নাটক'-এর কিছু অনুকরণ হলেও তাতে অসীম চক্রবর্তীর কল্পনা ও চালিকাশক্তি কোনওটাই ছিল না।

এইভাবে প্রকৃত অর্থে ব্রাত্য বসুর অদামৃতকথা হয়ে উঠেছে বাংলার সাধারণ মঞ্চের প্রস্থানবিন্দুর আখ্যানকথা। এর সঙ্গে মিলিয়ে যদি আমরা বাংলা থিয়েটারের 'শিশিরযুগ'-কে নিয়ে দ্যূতক্রীড়ক পড়ি, এবং জর্জ (দেবব্রত) বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ব্রাত্যরই রচিত ও পরিচালিত রুদ্ধসঙ্গীত নাটকটি পাঠ করে গণনাট্য আন্দোলনের উন্মেষ, সম্ভাবনা ও সংকটের স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা করি, তবে কেবল সন-তারিখ ও বিবরণভিত্তিক বাংলা নাটকের শুষ্ক আকাদেমিক ইতিহাস পড়ার চেয়ে তা অনেক মনোগ্রাহী হবে। সুখের কথা, শিশির ভাদুড়িকে নিয়েই ব্রাত্যর দ্বিতীয় আখ্যানকথা, উদ্বাসিত মান্দাস সম্প্রতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আমরা আবার একটা প্রাপ্তির অপেক্ষায় রইলাম।

শিবাজীপ্রতিম বসু : প্রাবন্ধিক ও প্রাক্তন উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ির শেষ জীবনের ছাত্র, বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক অনিল মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছেন নাট্যশিক্ষক হিসেবে।